OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 491 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 491 - 496
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

প্রেমে, প্রত্যাশায়, প্রতিবাদে, নারীত্বের উদযাপনে মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতা

ভাগ্যশ্রী তালুকদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID: bhagyashreetalukdar17@gmail.com
0009-0005-9316-6265

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
নারী, সংগ্রাম, যৌনতা, পুরুষ, ধর্ষকামী সমাজ, কবিতা, একুশ শতক।

Abstract

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে কবিতা ও তার আধুনিকতার বাঁকবদলের ইতিবৃত্তের সমীকরণ চর্চিত হয়েছে বারবার। সময়-সমকাল তার চিহ্ন রেখে যায় কবিতার শব্দ-শরীরে। যুগগত দাবি, তার আকাঙ্খা, প্রত্যাশা, তার যন্ত্রণার ইতিকথাও মিশে থাকে কবিতার আনাচে-কানাচে। একুশ শতকের কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। এই শতকের যুবকবেলায় দাঁড়িয়ে তার কবিতা তথা সার্বিক সৃজনীবিশ্বের মূল্যায়নের জন্য যে নিরপেক্ষ দূরত্বের প্রয়োজন তা হয়তো আমরা আজও পেরিয়ে আসতে পারিনি। তবে এই শতকের মানুষ ও তার সমাজমনের প্রবণতা খানিকটা অনুমান করার চেষ্টা একেবারে অযৌক্তিক হয়তো নয়। আর এই পরিচয়ের প্রথম পাঠ সাহিত্যের হাত ধরেই হয়তো সম্ভব। বিশ্বায়ন পরবর্তী পৃথিবীতে দ্রুত পরিবর্তনশীল একটা সময়ের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি এই শতকের নারী তার ভালোবাসার দাবিতে, যৌনতা কিম্বা প্রেমের উচ্চারণে, প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণায় শতাব্দী-প্রাচীন নৈঃশব্দের প্রাচীর ভেঙে দাঁড়িয়েছে সমাজের মুখোমুখি। জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র উচ্চারণে এই নারী স্বয়ংসম্পূর্ণা। এই পূর্ণতার অন্বেষণ অবশ্য ফেলে আসা শতকেরই দীক্ষা। নারীজীবনের এই অভিযাত্রার আখ্যানই রচনা করেছেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন।

Discussion

সময়ের নিত্য প্রবহমানতার সাথে জড়িয়ে আছে সভ্যতার বাঁকবদলের ইতিবৃত্ত। সমাজ,অর্থনীতি কিভাবে এই সভ্যতার আদল তৈরি করে তার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা আজ শতাব্দী পেরিয়েছে। আর এই আলোচনায় অনিবার্যভাবে জুড়ে যায় আধুনিকতার অনুষঙ্গ। প্রতিটি যুগের একটা নিজস্ব অববয়ব নির্মিত হয় তিলে তিলে। বিবিধ উপাদানের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে সেই যুগের স্বরূপ ও তার মধ্যে নিহিত আধুনিকতার উপাদানগুলির অনুসন্ধান নতুন কোন ঘটনা নয়। এই মূল্যায়নের পথে সেই যুগের সাহিত্যিক নির্মাণগুলির গুরুত্ব স্বীকারে দ্বিধার বিশেষ স্থান নেই। কারণ একটি সাহিত্যিক নির্মাণ অনিবার্যভাবে তার যুগচিহ্নকে বহন করে। সমকাল-অতিক্রমী চিরন্তনত্বের প্রতিশ্রুতি ধারণ করলেও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 491 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমকাল ছায়া ফেলে তার শব্দ-শরীরে। মধ্যযুগের ধর্ম-অনুশাসিত, প্রথাবদ্ধ কাব্যকাঠামোতেও কবি ও তাঁর সমকাল সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করতে পেরেছে এমনটা নয়। আত্মপ্রকাশের মানবিক ও জান্তব চাহিদার সূত্র মেনে সময় ও সমকাল সেখানে স্থান করে নিয়েছে। রাবণ কর্তৃক অপহৃত সীতার পরিত্যক্ত অলংকারের মতোই তা দিক নির্দেশ করেছে অনুভবী-অনুসন্ধানী পাঠককে। সেই সংগৃহীত উপাদান জুড়ে পাঠক পায়ে পায়ে প্রবেশ করে লেখকের সৃজনীবিশ্বের অন্দরমহলে। আবার কখনো অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সমানুভূতিও মিলিয়ে দেয় লেখক ও পাঠককে। কোন একটি উপলব্ধি, শব্দের দীর্ঘ অন্বেষণ শেষে হয়তো আশ্রয় পেল কবিতার কোন এক নিভৃত পংক্তিতে। আসলে মনুষ্য হৃদয় শব্দসন্ধানী। একবিংশ শতকের যুবকবেলায় দাঁড়িয়ে সাধ হয় এই শতাব্দীর শব্দ-সন্ধানী হৃদয়কে খানিকটা বুঝে নেওয়ার। পঁচিশটা বসন্ত পেরিয়ে এই শতাব্দীর দেহমন নিজস্ব একটা ছন্দ বেঁধেছে বলেই মনেই হয়। যদিও এই শতকের সৃজনীবিশ্বের সার্বিক মূল্যায়নের জন্য যে নিরপেক্ষ দূরত্বের প্রয়োজন তা হয়তো আমরা আজও অর্জন করতে পারিনি তবে তার প্রবণতাগুলোকে খুঁজে দেখবার একটা চেষ্টা একেবারে অযৌক্তিক হয়তো নয়।

কবিতার জন্মের ইতিহাস খনন করলে মেলে তার প্রাচীনতার অজস্র সাক্ষ্য। কবিতাকে অন্যতম প্রাচীন একটি সাহিত্য-সংরূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না একেবারে। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারায় তার অজস্র বাঁকবদল একান্তই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। যার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে সমাজ, ইতিহাসের বিবর্তনের চেহারা। যার মধ্যে নারীর অবস্থান ও তার স্বরকে চিনে নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। আজ একবিংশ শতকের বিশ্বায়ন পরবর্তী পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি, এই শতকের নারী তার ভালোবাসার দাবিতে, যৌনতা কিম্বা প্রেমের উচ্চারণে, প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণায় শতাব্দী-প্রাচীন নৈঃশব্দের প্রাচীর ভেঙে দাঁড়িয়েছে সমাজের মুখোমুখি। জ্ঞানে,প্রজ্ঞায়, ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র উচ্চারণে এই নারী স্বয়ংসম্পূর্ণা। এই পূর্ণতার অন্বেষণ অবশ্য ফেলে আসা শতকেরই শিক্ষা। মধ্যযুগীয় অনুশাসন ও তৎপরবর্তী পরাধীনতার অভিজ্ঞতা ও তারপর স্বাধীনতা-উত্তর নাগরিক জীবনের স্বতন্ত্র সংঘর্ষ অতিক্রম করে আজকের নারী মুখোমুখি হয়েছে নতুন শতাব্দীর। কবি মন্দাক্রান্তা সেনের কলমে ফুটে ওঠে সেই সংগ্রামের ইতিকথা। প্রেমে, প্রত্যাশায়, প্রত্যাখ্যানে, কিম্বা যৌনতার জান্তব ঘোষণায় তাঁর কবিতা নারী হৃদয়ের বিশুদ্ধ এক উচ্চারণ। যে উচ্চারণে মিশে আছে অগুণতি মৃত্যুর পরেও ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি। রয়েছে জীবনের শ্বাপদসংকুল প্রান্তরে বারম্বার ক্ষতবিক্ষত হয়েও প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়ানোর স্পর্ধা। এই প্রতিপক্ষ কখনো সমাজ, কখনো প্রিয় পুরুষ, কখনো বা সে নিজেও। মন্দাক্রান্তার কবিতায় শোনা যায় চলমান জীবনের স্পন্দন। তাঁর কয়েকটি কবিতার আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিষয়টিকে বিস্তারে আলোচনা করা যেতে পারে।

মন্দাক্রান্তা সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ (‘হৃদয় অবাধ্য মেয়ে’) প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। নামকবিতাতেই[১] তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন ‘হৃদয় অবাধ্য মেয়ে/ তাকে কী শাস্তি দেবে, দিও’। সমাজ শিখিয়েছে অবাধ্যতার শাস্তি বাধ্যতামূলক। কিন্তু কবি জানেন এই অবাধ্য নারীহৃদয়কে কোন শাস্তির আশঙ্কাই নিবৃত্ত করতে পারবে না। সমাজ কিম্বা বিধাতার নির্ধারিত ভবিতব্য সে মুছে ফেলতে পারে থুতু দিয়ে ঘষে ঘষে। অবাধ্য, স্বেচ্ছাচারী হৃদয়ের প্রতি স্নেহ ও প্রশ্রয়ের আশ্বাস কবিতাটিকে বিশেষ করে তুলেছে। বুঝতে পারি, সমাজের চূড়ান্ত পুরুষালি নিয়ন্ত্রণ এই নারীমনে সহজে ভাঙন ধরাতে পারবে না। পারবে না তাকে অনুশাসনের কঠোর শৃঙ্খলের পাকে জড়িয়ে ফেলতে। শাস্তি পেলেও এই হৃদয় স্পন্দিত হবে নিজস্ব ছন্দে। একুশ শতকের জন্মলগ্নে এইভাবেই রচিত হল অবাধ্য মেয়েদের চলার পথের গান।

বিংশ শতকের শেষ পর্বে ভারতের সমাজ, অর্থনীতির রক্ষণশীল অববয়বে অতিদ্রুত পরিবর্তনের লক্ষণ ফুটে উঠল। অর্থনৈতিক সংস্কার ও বিশ্বায়নের ফলে সমাজজীবনে স্পষ্টতই একটা পর্বান্তর দেখা গেল। পশ্চিমী আলোতে তৃতীয় বিশ্বের সমাজ ও পরিবর্তিত প্রবণতাগুলিকে নতুন করে চিহ্নিত করার একটা চেষ্টা দেখা দিল। নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপকে গত শতাব্দীর ধূলো ঝেড়ে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হলো। এদেশে নারীমুক্তি ও নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যে দীর্ঘ লড়াইয়ের নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে, তাকে উপেক্ষা করে পশ্চিমী আলোতে পুনর্মূল্যায়নের এই চেষ্টা ন্যায্য কারণে চর্চিত হয়েছে - নিন্দিতও হয়েছে। তবে বিজ্ঞাপনের এই স্বর্ণযুগে নারীর ক্ষমতায়নের এই নব্য প্যাকেজিং যে বর্জিত হয়েছে তেমনটা নয়। পাশাপাশি নারীমন, তার যৌন আকাঙ্খা, তার কামনা-বাসনা সমস্তটাই বিশ্লেষিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তার মনস্তত্ত্বের নিগুঢ় কন্দরে যুক্তির আলো প্রক্ষিপ্ত হয়েছে সমস্ত প্রেক্ষণ কোণ থেকে। নিরন্তর এই যৌক্তিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 491 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও তার্কিক মূল্যায়নের মাঝে প্রশ্ন জাগে নারীর একান্ত নিজস্ব চাহিদা আজ কোন বিন্দুতে বা সিন্ধুতে এসে দাঁড়িয়েছে। নারীমনের গহীনে পথ খুঁজতে গেলে একজন নারীই হতে পারেন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় সেই নারী মনের মানচিত্রই ফুটে ওঠে একটু একটু করে।

'জিন্‌স পরা ছেড়ে দিতে পারি/ তুমি যদি বলো' এমন আত্মসমর্পণের উচ্চারণে 'তুমি কি সাঁতার জানো'[২] কবিতাটির সূচনা। প্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য কামনায়, নিমেষে নিজের অচেনা, ভিন্ন এক নারী হয়ে ওঠার দৃপ্ত প্রতিশ্রুতিও রয়েছে ক্ষীণাঙ্গী কবিতাটিতে। একুশ শতকের নারী যখন নতুন দিনের আলোতে নিজেকে আবিষ্কার করছে পুনর্বার, তখন এই কবিতাটি ভীষণ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। এই তাৎপর্যের কারণ প্রিয় পুরুষের প্রতি প্রবল আকর্ষণে আত্মবিলোপের আশ্বাস নয়। প্রণয়াকর্ষণের মুগ্ধতাকে সরিয়ে রেখে, সে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারে প্রিয় পুরুষের চোখে চোখ রেখে। ফেলে আসা শতকের কোন নারী কখনো যে সমাজ বা প্রিয় পুরুষের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করেনি তেমনটা হয়তো নয়। নিত্যদিনের সংগ্রামময় যাপনের মধ্যে দিয়ে অজস্র প্রত্যাখ্যান, উপেক্ষা, তাঁরা অনায়াসে জয় করেছেন। আজকের একুশ শতকের নারী সেই দীক্ষামন্ত্র নিয়েই পথে নেমেছে। পোশাকে,চলনে, তৈল-বিহীন অবাধ্য চুলের রুক্ষতায় সেই সেদিনের সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে এ যেন তার উদাসীন প্রতিবাদ। আজকে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, অজস্র ভাঙনের শেষে সে বহতা নদী হতে পারে প্রিয় পুরুষের পদমূলে। কিন্তু সেই গহীনে, বহমান স্রোতধারায় টিকে থাকার শিক্ষা আজকের পুরুষের করায়ত্ত হয়েছে কি? কবিতার অন্তিম চরণে ছুঁড়ে দেওয়া এই প্রশ্ন যেন চ্যালেঞ্জের মতন আছড়ে পড়ল সমাজের মুখে।

প্রসঙ্গত স্মরণে আসে অপর একটি কবিতাও। একদিকে প্রেমিকের অমোঘ আকর্ষণ আর অন্যদিকে পরিবারের কাছে নীরব আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে 'একটি আধুনিক প্রেমের কবিতা'য়[৩]। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সহজিয়া গতিতে কবিতাটির স্বচ্ছন্দ চলন। প্রেমিকের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও বেকারত্বকে উপেক্ষা করতে পারেননি প্রেমিকার মা। অতএব অন্যত্র স্থির হয়েছে বিবাহ। অন্তরের হাহাকার ফুটে ওঠে যখন প্রেমিকা বলে, বিবাহের যাবতীয় মাঙ্গলিক প্রস্তুতির মাঝেও 'আমি তোমায় ভাবব সারারাত'। সেকালের রাধা কুল হারিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে। লোকলজ্জা বা সামাজিক কোন অনুশাসনই তাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। কিন্তু একালের রাধা প্রশ্ন করে - 'কীসের জোরে ভাঙব কুলের বাধা!' আসলে একুশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্বায়িত পৃথিবীর লক্ষণগুলি যখন সভ্যতার শরীর-মনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে অনায়াসেই উপলব্ধি করা গেছিল, শুধুমাত্র ভালোবাসাকে ভরসা করে অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকা অসম্ভব। চাকরি, উপার্জন, বাসস্থানের মতন বাস্তব চাহিদাগুলি ক্রমশ ভালোবাসার স্বর্গরাজ্যে ঘনিয়ে আনবে সংঘাতের কালো মেঘ। অগত্যা বাস্তববাদী নিরুপায় প্রেমিকা খুঁজে নেয় নিরাপদ সাহচর্য। প্রেমিকের জন্য রেখে যায় কম্পিউটার কোর্সের পরামর্শ। যুগোপযোগী এই ডিগ্রি নিঃসন্দেহে তার প্রাক্তনকে একদিন বিবাহবাজারের উপযুক্ত করে তুলবে। বিশ্বায়নের পৃথিবী চকিতে ধরা দিয়ে যায় আলোচ্য কবিতাটিতে।

আবার এক চিরকালের প্রেমময়ী নারীমন ধরা দেয় 'বল অন্যভাবে' কাব্যগ্রন্থের 'পথ'[৪] কবিতায়। এই নারীহৃদয় আবিষ্কার করেছে প্রিয় পুরুষের চোখে দীর্ঘ একটি পথ থেমে আছে। সেই পথ অজস্র সম্ভাবনায় ভরা। অথচ জনহীন নিঝুম শূন্যতা ব্যতীত সেখানে সমস্তই স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। বিপরীতে রয়েছে চিরকালীন এক নারীহৃদয়, যে প্রিয় পুরুষের অপেক্ষায় পেরিয়ে চলে ছায়াহীন কাঁটাঝোপ, নোনাবালি। দিগভ্রান্ত হৃদয়ের অনন্ত এই পথচলা। কোন সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক পথরেখা অদৃষ্ট তাকে চিনিয়ে দেয়নি। পথ তাই অতি দুরাশার মত লাগে। কবি প্রশ্ন করেন 'এসব পেরিয়ে হাঁটছে কে একজন, তুমি তাকে চেনো?' এই পথচলায় যেন মিশে যায় হাজার বছরের অপেক্ষারত নারীহৃদয়ের আকুতি। মনে হয়, এই প্রশ্ন যেন নারীমনের স্বগতোক্তি। দিশাহীন ক্রমগত এক পরিক্রমায় নিজের সাথে বোঝাপড়ার প্রয়োজন আছে বইকি! কবিতার সুদীর্ঘ পংক্তিগুলির ধীর চলনে সুদীর্ঘ পথচলার ক্লান্তি, বিষণ্ণতা যেন ভাষা পেয়েছে। ফেরানো চোখের দৃষ্টিতে পথের সন্ধান ও অন্তিম পংক্তির ঈষৎ অভিমানী উচ্চারণ কবিতাটিকে গভীর ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে।

এই নারীমন সহস্র ভাঙন সত্ত্বেও আশ্রয় দেয় অতিথিকে। প্রতীক্ষা করে প্রিয়তমের। অথচ সে জানে এই ঘরবাড়ি সমুদ্রবালিতে গড়া। এই সাহচর্য, প্রিয়জন-সান্নিধ্য অবসরের অবলম্বন মাত্র। কাঙ্ক্ষিত পুরুষের কামনার উত্তাপে নারী বারবার নিজেকে ভেঙেচুরে সাজিয়ে নিতে চায় প্রিয় পুরুষের পছন্দের মোড়কে। কখনো সে হতে চায় 'সহজ কিশোরী নদী, গভীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 491 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চোখের মতো বন'[৫] আবার তার সোচ্চার ঘোষণার মাঝে মিশে থাকে গভীর অভিমানী আক্ষেপ – তোরই জন্য আজীবন হয়ে আছি পৃথিবী, আকাশ/ তবু তোর গৃহ নই, আমি তোর অতিথিনিবাস' ('অতিথিনিবাস'/ 'বলো অন্যভাবে')। সংসারের সীমায়িত গণ্ডীতে কবি জোর করে বাঁধতে চাননি প্রেমিকের মনকে। তার জন্য জমানো আছে আকাশের বিস্তার, রয়েছে পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশের নিভৃত যাপন। এই অসীমের আশ্বাস সত্ত্বেও তিনি প্রেমিকের গৃহ তথা নিত্যদিনের যাপনসঙ্গী হয়ে উঠতে পারলেন না। আসলে ঘর শব্দটার সঙ্গে অভ্যস্ততার অনুষঙ্গ জড়িয়ে যায় অচিরেই। প্রেমিক চাননি এই প্রাত্যহিকতার নিয়ম নিগড়ে আটক হতে। অবশ্য নিজবাসভূমে ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গে প্রেমিকের সমান্তরাল একটি জীবনের ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই প্রেমিকার অপেক্ষা আগামী ছুটির মরসুম। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ হল এই প্রতীক্ষা নারীর স্বেচ্ছা নির্বাচন। সমাজ নির্ধারিত সম্পর্ক ও জীবন কাঠামোকে অস্বীকার করার আত্মবিশ্বাস বিগত শতকের কোন নারী অর্জন করতে পারেননি তেমনটা নয়। তবে অস্বীকৃতির এই ঘোষণা, এই প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর একুশ শতকের দান বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না।

যৌথজীবনের প্রসঙ্গও এসেছে তাঁর বেশ কিছু কবিতায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'সংসার'[৬] শীর্ষক কবিতাটি। সংসার আসলে এক যৌথজীবনের উদযাপন। অন্তত নারী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তরে নির্মিত আধুনিক পৃথিবীতে তেমনটাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু ধূলোমাটির বাস্তবতায় গড়ে ওঠা ভালোবাসার সংসার আস্তে আস্তে ভিন্ন একটা আদল নেয়। দীর্ঘদিনের অযত্ন, নৈশব্দ আর অভ্যাসের যান্ত্রিকতায় সেই চেনা সংসারের মধ্যিখানেই কোন অজান্তে ঘনিয়ে ওঠে এক মৌন সভ্যতা। যে বোবা সভ্যতা আসলে এক যান্ত্রিক সহাবস্থান মাত্র। দীর্ঘদিনের নৈঃশব্দ জমতে জমতে একদিন পাহাড়প্রমাণ হয়ে যায়। বিশ্বায়ন পরবর্তী পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও যাপনে অতি দ্রুত বিবর্তন ঘটে গেছে। ভোগবাদী মনোভাব, বিজ্ঞাপন সর্বস্ব অর্থহীন যাপন সেই বিবর্তিত সময়-সমাজের মূলে। এমন অন্তঃসারশূন্য মৃত সম্পর্ক আমরা প্রতিনিয়ত দেখে চলেছি আমাদের চারপাশে। বাধ্যতা বা অভ্যাসের কোন একটি ক্ষীণ বিন্দু জুড়ে রেখেছে দুটো প্রেমহীন মানুষকে। সামান্য দীর্ঘশ্বাস হয়তো টলিয়ে দিতে পারে এই যান্ত্রিক অভ্যস্ততার ভারসাম্য। সেদিন অজস্র টুকরোয় ছড়িয়ে পড়বে অন্তঃসারশূন্য এই যৌথযাপন। আবার কখনো মনে হয় এই কবিতার মধ্যেই নিহিত আছে এই এই অন্ধকূপ থেকে মুক্তির পথসংকেত। কারণ কবিতার ভরকেন্দ্রে থাকা 'স্পর্শপ্রবণ' শব্দটি। যে শব্দহীনতা স্তরে স্তরে জমে নির্মাণ করেছে এই মৌনপৃথিবী, সেই স্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে যাবে ভালোবাসার বিশুদ্ধ স্পর্শে। সামান্য দীর্ঘশ্বাস যেদিন বাঙ্ময় হয়ে উঠবে শাব্দিক আনন্দে, সেদিন এই মৌন পৃথিবীর প্রতিটি প্রকোষ্ঠে ধ্বনিত হবে মুক্তধারার উজানগান।

আমরা বিশ্বাস করি কবি সত্যদর্শী। নিত্যবহমান জীবনের স্রোত থেকে, প্রাত্যহিকতার ক্লান্তিময় যাপনের মাঝেই কবি খুঁজে পান অমৃতের সন্ধান। যে জীবনের আর্ত আকুতি আমরা প্রতিনিয়ত অগ্রাহ্য করি - অস্বীকার করি তার সংযোগসূত্রকে, সেই জীবন ছেনে কবি নিয়ে আসেন অনন্তের ইঙ্গিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ ও সময়ের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি টের পান পতনের শব্দ। সময় ও সমাজের অবক্ষয় তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। অস্থির দগ্ধ দিনের কথা তিনি উচ্চারণ করেন কবিতার শাব্দিক অলিন্দে। সমাজের সেই অসুখের কথা বারবার ফিরে এসেছে মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায়। একুশ শতকে সার্বিক পণ্যায়নের যুগে, নারীর যৌনতাও পণ্যায়িত হয়েছে প্রবলভাবে। নারীকে ভোগ্যপণ্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বারবার। ভারতবর্ষীয় সমাজকাঠামোয় উগ্র পৌরুষের চর্চা চিরকালীন। তার সঙ্গে এই ভোগবাদী প্রবণতা ধর্ষকামী সমাজমনকে আরো লালায়িত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মন্দাক্রান্তা সেনের 'ছদ্মপুরাণ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ভাসান'[৭] শীর্ষক কবিতাটি। কবিতাটি শুরু হয়েছে পুরনো ঘর, অগোছালো শাড়ির পরিচিত ও অভ্যস্ত গার্হস্থ্য ছবির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু অচিরেই সেই পরিচিত কাঠামোর চৌকাঠ পেরিয়ে কবিতার 'নির্বোধ মেয়ে' আমাদের নিয়ে যায় আদিম, ভয়াল আঁধারের অনিশ্চিত পথে - নারীজন্মের দ্বিতীয় বাঁকে। কবিতাটিতে 'রোজ রাত্রে বিকোবার' মতোন পংক্তি, পুরুষের নিষিদ্ধ নৈশ আশ্রয়ের ইঙ্গিত যেমন বয়ে আনে, তেমনি দাম্পত্যের ক্লান্তিকর ও যান্ত্রিক যাপনের অনুষঙ্গও যেন এই পংক্তিতে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এই অন্ধকূপ থেকে মুক্তি পেতে সেই মেয়ে পা বাড়িয়েছিল রোদ্দুরের পথে - নারীজন্মের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। কিন্তু সেই 'নির্বোধ মেয়ে' ভরসা রেখেছিল অন্ধকারে। যে আঁধার নতুন দিনের প্রস্তুতিকাল, সেই একই আঁধার বন্য শ্বাপদের নির্বিঘ্ন চারণভূমিও বটে। সেই আদিম অন্ধকার আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে নিল তার 'বেআব্রু শরীর'। এখানে 'বেআব্রু' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 491 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনে হয়। যেই মুহূর্তে নারী তার আত্মপ্রকাশের ভোরের কাছে পৌছাতে চেয়েছে, ঠিক তখনই যূথবদ্ধ হয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ালো ধর্ষকামী সমাজ তথা পুরুষ। অতঃপর 'গণধর্ষণের পর খোলামাঠে পড়ে রইল লাশ/ কণ্ঠে ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁস'। এখানে একটুকরো ব্লাউজ যেন সমাজের ছিন্নপ্রায় সূত্রের মতন লেগে থাকে ধর্ষিতা নারীশবের শরীরে। কবিতার অন্তিম চরণে পৌনঃপুনিকতার অনুষঙ্গটি কবিতাটিকে বিশেষ করে তুলেছে। সেখানে দেখি, ঘরছাড়া নারীর ঘরে আজ এক নতুন মেয়ে, তার অঙ্গে আবার সেই ছেড়ে যাওয়া শাড়ি। এই পুনরাবৃত্তি বুঝিয়ে দেয়, আবার সেই নারী যদি নবজন্মের স্বপ্ন দেখে, ভেঙে ফেলতে চায় সমাজ-নির্ধারিত যাপন-কাঠামো, সেদিন আবারো তার মুখোমুখি হবে ধর্ষকামী সমাজ। আর এখানেই কবিতার 'ভাসান' নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাসান শব্দটির সাথে মিশে আছে পুজো ও বিসর্জনের অনুষঙ্গ। আমাদের অন্তরের নিরাকার ঈশ্বরভাবনা আকার পায় মৃন্ময়ী দেবীমূর্তিতে। অতঃপর সেই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পুজোর শেষে মূর্তি বিসর্জিত হয় জলে। মৃৎপ্রতিমা মিলিত হন প্রকৃতির মাঝেই। আলোচ্য কবিতাতেও দেখা গেল ধর্ষিতা নারীর মৃত শরীর কারা যেন পুঁতে দিল তাড়াতাড়ি। এই বিসর্জিতা নারীও এভাবেই মিলিয়ে গেল জল হাওয়া রোদ্দুরের পৃথিবীতে। হয়ত আগামীতে অন্যকোন দেবীমূর্তির পূজনীয় মৃৎকাঠামোয় মিশে থাকবে এই ধর্ষিতার অস্থিমজ্জা! ধর্ষণ পরবর্তী প্রহসনের কাহিনিটুকু ধরা আছে এই কাব্যগ্রন্থেরই 'লজ্জাবস্ত্র'[৮] কবিতায়। লজ্জাবস্ত্র শব্দটির সাধারণ অর্থের পাশাপাশি বিবাহ সম্পর্কিত একটি লৌকিক অনুষঙ্গও রয়েছে। সিঁদুরদানের পর লজ্জাবস্ত্র দিয়ে নববধূর মুখ ঢেকে দেওয়া হয় হিন্দুবিবাহ রীতিতে। এই বস্ত্রখণ্ডটিই সেই মুহূর্তে যেন নিজের সাথে বোঝাপড়ার একটা ক্ষণিকের নিভৃতি নিয়ে আসে। এই মুহূর্তটুকুর ওপারেই অপেক্ষমান এক প্রত্যাশার পৃথিবী। পুরুষশাসিত সমাজকাঠামোতে, নারীর স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়াশীল। নারীর স্বাধীনতা বা সাম্যের অধিকারে আজও তাই নামতে হয় পথে- ময়দানে। কখনো সেই দ্বৈরথে জয়ী হয় নারী আবার কখনো ধর্ষকামী পুরুষ ছিন্নভিন্ন করে দেয় তার অস্থিমজ্জা। পুরুষের বিকৃত কামনা ও লালসার উন্মত্ত আস্ফালন কীভাবে ধর্ষণের মতন ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে তার উদাহরণ 'লজ্জাবস্ত্র' কবিতাটি। কবিতাটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে অসহনীয় এক আর্ত আকুতি। এই ধর্ষকাম সমাজ ও বিকৃত পৌরুষ প্রতিনিয়ত শোষণ করে চলেছে নারীকে। এই কবিতা চিনিয়ে দেয় মনুষ্যত্বের অসুস্থ চেহারাটাকে। বুঝিয়ে দেয় নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও নারীর স্বাধীনতা আসলে তত্ত্ব ও তর্কের কেতাবি পরিসরেই শ্রদ্ধেয়। রক্তমাংসের বাস্তবতায় নারীশরীর আজও ভোগ্যপণ্য ব্যতীত কিছুই নয়। লজ্জাবস্ত্র আসলে এই সমাজের প্রাপ্য। যে সমাজ তার উদ্যত নখ-দাঁত নিয়ে নিরন্তর বিক্ষত করে চলেছে নারীর অস্তিত্বের সংগ্রামকে। অথচ এই অভাগা দেশই পূজিতা হয় মাতৃরূপে। কিন্তু নাগরিক দায়বদ্ধতা সীমাবদ্ধ নারীশক্তির স্তুতিতে। তাই দিনের শেষে উলঙ্গ শব ঢাকা পড়ে পতাকায়। আলোচ্য কবিতাটি এই নির্লজ্জ সমাজ ও সভ্যতার সমস্ত আস্ফালনের উপর চাবুকের মতন আছড়ে পড়ে।

বিশ্বায়িত পৃথিবী, রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজকাঠামোর অন্দরে বয়ে এনেছিল নতুন যুগের বাতাস। যে নিঃশব্দ উদাসীনতা যৌনতাকে এতদিন আড়াল করে রেখেছিল চর্চার স্পর্শ বাঁচিয়ে, একুশ শতকীয় সভ্যতায় অহেতুক আড়ালকে প্রত্যাখ্যান করে সেই যৌনতাই অনেকখানি চর্চার আলোতে এসেছে। নারীর যৌনসুখ ও যৌন চাহিদার মতন বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক বেশি চর্চিত ও আলোচিত হয়েছে বর্তমান সময়ে। যদিও এর পাশাপাশি যৌনতার পণ্যায়নের প্রসঙ্গটিও পর্যালোচনার দাবি রাখে, তবে সামগ্রিকভাবে যৌনতা কেন্দ্রিক এক অস্বাভাবিক নৈশব্দ, তার শতাব্দী প্রাচীন সংস্কারকে অতিক্রম করতে পেরেছে, সে কথা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যও সেই সমাজমনের সফল প্রতিনিধিত্ব করেছে। নারীর যৌনচাহিদা, তার আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা বারবার সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বিগত শতকের কবিতাতেও নারীর শরীরী আকাঙ্ক্ষা সর্বাংশে উপেক্ষিত হয়েছে, এমনই কখনোই বলা যাবে না। কিন্তু তার স্পষ্ট ঘোষণায়, বিবিধ যৌন অনুষঙ্গের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কবিতার বিষয়কে উপস্থাপিত করার প্রবণতায় একুশ শতকের কবিতার বয়ান বিশেষ আকর্ষণ দাবি করে। বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতি উল্লেখের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেখা যেতে পারে।

১. 'দু'জনেরই প্রতি রোমে রোমে/ জেগে ওঠে শরীরের সাধ/ পরস্পরের তীব্র ওমে/ ভেঙে যেতে চাওয়া কোনো বাঁধ' (সাধ/ চাঁদের গলায় শালা দড়ি)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 491 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. আমাকে মিলনোন্মুখ দেখে/কাম বিলম্বিত হয়/এ ঔষধ শুধুমাত্র পুরুষের জন্য/ এই বিজ্ঞাপন দেখে/ আমি কেটে রাখি খবরের কাগজ/যোনিরসে ভিজিয়ে, মণ্ড করে,/ বেটে খাই/দুয়োরানির সন্তান হবে বলে... (বিষ/ এমন নৃশংস আয়োজন)

৩. 'আশরীর রোমকূপে ঠোঁট রেখে কোন মন্ত্র দিবি?/ এই ঘরে একটানে খুলে ফেললি গোপন পৃথিবী!' (দেহতত্ত্ব/এ সবই রাতের চিহ্ন)

৪. 'ঝোড়ো শ্বাস, সিঁড়ির আড়ালে/ অতর্কিতে বিছে কামড়ালে/ রক্তময় জ্বালা অনর্গল (একটি অসম পরকীয়া/ হৃদয় অবাধ্য মেয়ে)

এমন অসংখ্য যৌন অনুষঙ্গের সাবলীল ও অনারোপিত প্রয়োগ মন্দাক্রান্তা সেনের বিভিন্ন কবিতায় আমরা দেখতে পাই।

নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই মানবেতিহাসের অভিযাত্রা। এই মানুষের ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে সভ্যতার একটা পর্যায়ে এসে আমরা বুঝতে পারি নারী এবং পুরুষের প্রগতির ইতিহাসটা ঠিক একরকম নয়। প্রকৃতিনির্দিষ্ট লিঙ্গপরিচয় যেন ছাপিয়ে গেল তার মনুষ্য-পরিচয়কে, সেদিন থেকেই হয়তো এই কাহিনির সূত্রপাত। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নারী ও পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুখোমুখি হয়েছে সমস্ত প্রতিকূলতার। সভ্যতার রথচক্রে গতিদান করেছে তাদের যৌথ শ্রম ও উদ্যোগ। কিন্তু প্রভুত্বকামী পুরুষমন একদিন আখ্যানটাকে বদলে দিতে চাইল। আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি পুরুষতন্ত্র আর পুরুষ শব্দদুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষ মানেই প্রবল পরাক্রমে নারীর স্বাধীনতা আর অগ্রগতির পথ আগলে দাঁড়িয়েছে স্পর্ধিত দর্পে - তেমনটা কখনোই নয়। পুরুষতন্ত্র আসলে একটা অসুস্থ সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ যেখানে সঞ্চিত হয়েছে অনেক কালের অন্ধকার। এই আঁধার হিংসা-দ্বেষ-অপ্রাপ্তি আর সংকীর্ণতার উল্লাসমঞ্চ। অসংখ্য নারীও প্রতিনিয়ত করে চলেছে এই অন্ধকারের উপাসনা। এই রকম সহস্র প্রতিকূলতার মাঝেই পথ কেটে চলে নারীর আত্মপ্রকাশ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই তার নিরন্তর আত্ম আবিষ্কার। আজ একবিংশ শতাব্দীর যুবকবেলায় দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি এই দ্বৈরথের নিষ্পত্তি আজো হয়নি। নির্দয় সমাজ, যা আসলে এই প্রভুত্বকামী মনেরই প্রতিনিধি, বারবার অপদস্থ করতে চেয়েছে নারীর আত্মবিশ্বাসকে। মাটিতে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে তার অস্তিত্বকে। কিন্তু প্রবল প্রতিস্পর্ধায় বারবার সেই মেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় জীবনের মুখোমুখি। আসলে সে জানে এই দ্বন্দ্ব, এই সংগ্রাম, সৃষ্টির শেষ কথা নয়। তাই এই দ্বন্দ্বের মধ্যেও নারী খোঁজে বান্ধব, খোঁজে সহযাত্রী। খোঁজে সমস্ত ক্লান্তি আর সংঘর্ষের শেষে একটা স্বপ্নময় নির্ভরতার আশ্বাস। নিরন্তর তার প্রেমের অন্বেষণ। এই অনুসন্ধানের মাঝেই কখনো নারী বুঝতে পারে ভালোবাসার মানুষটাই আস্তে আস্তে একটা পরিপূর্ণ 'ঘর' হয়ে উঠেছে। খানিক জিরিয়ে নিয়ে দুঃসাহসী ডানা মেলে সে উড়ে চলে অজানা আগামীর পথে। অরণ্যের দহন, পাহাড়ি পাকদণ্ডী, মরুভূমির অনন্ত নির্জন ধূসর তার যাত্রাপথে ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। তবু সে বিশ্বাস করে গতির মন্ত্রেই। এই নারীজীবনের আখ্যানই রচনা করেছেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন।

Reference:

১. সেন, মন্দাক্রান্তা, মন্দাক্রান্তা সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০২৩, পৃ. ১৩
২. তদেব, পৃ. ২০
৩. তদেব, পৃ. ২১
৪. তদেব, পৃ. ৩১
৫. তদেব, পৃ. ৩১
৬. তদেব, পৃ. ১৭৫
৭. তদেব, পৃ. ৫৩
৮. তদেব, পৃ. ৫৪